তারিখ ..19 FEB 2014..
পৃষ্ঠা ..৬.. কলাম.....

যুগান্তর

ভাষা ও বিদ্যমান শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে ভাবনা

এ কে এম শাহনাওয়াজ

ফেব্রুয়ারি এলেই আমরা ভাষা প্রশ্নে নড়েচড়ে উঠি। বাংলা ভাষার মর্যাদা নিয়ে কথা বলি। একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ার পর থেকে পৃথিবীর তাবৎ ভাষার সংরক্ষণ ও উন্নয়ন নিয়ে আমাদের দায়দায়িত্বের কথাও বলি। টেলিভিশন চ্যানেলগুলোর টকশো মুখরিত করেন মুখর-মুখরা জ্ঞানীজন। চমৎকার শব্দমালায় বক্তৃতার মঞ্চ আলোড়িত হয়। পত্রিকার পাতায় নানা শিরোনামে প্রকাশিত হয় নিবন্ধ। যেমনটি আজ আমি লিখছি। আসলে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ দিনগুলোর গুরুত্ব এখানেই যে, অন্তত সেই বিশেষ দিন যে চৈতন্য ধারণ করে আছে, সারা বছর তা পাথরচাপা থাকলেও বছরের বিশেষ সময়ে দৃশ্যমান হয়। এতেও যদি নতুন করে প্রাণিত হতে পারে দেশের কিছু মানুষ ও নীতিনির্ধারকরা, তাহলেই বা মন্দ কী!

একুশে আমাদের অহংকার হলেও একুশের মূল চেতনা থেকে আমরা ক্রমে দূরে সরে যাচ্ছি শুধু সংস্কৃতিবোধ ও ইতিহাস চেতনা বিচ্ছিন্ন হওয়ার কারণে। ভাষা আন্দোলনের পর ৬০ বছর পেরিয়ে গেলেও বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির যতটুকু বিকাশ ঘটার কথা ছিল তার সিকিভাগও ঘটেনি। এমন কথাও বলা হয় যে, বিশ্বায়নের যুগে বাংলা ভাষা চর্চা এত জরুরি কেন? এখন বিশ্বসংস্কৃতির জোয়ারে গা ভাসাব— বাঙালি সংস্কৃতি নিয়ে পড়ে থাকা কেন? ফলে একই দেশে তিন-চার ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা অসম প্রতিযোগিতায় এগোচ্ছে। এ জগাখিচুড়ির মধ্যে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বাংলা ভাষা ও বাঙালি সংস্কৃতি। স্পষ্টতই চারটি শিক্ষাধারা এখন প্রচলিত। মূলধারার বাংলা মাধ্যম স্কুল এবং এর ইংরেজি ভার্সন, ইংরেজি মাধ্যম স্কুল, আলিয়া ও কওমি ধারার মাদ্রাসা শিক্ষা। আগে বাংলা মাধ্যম স্কুলগুলোর পাঠক্রম ও ছাত্র-শিক্ষক আন্তঃসম্পর্কে বাংলা চর্চায় তাদের উভয়ের সচেতনতা যতটা ছিল, এখন আর তেমনটি নেই। এসএসসি ও এইচএসসির ফলাফলে অধুনা বিলুপ্ত তারকা চিহ্নিত ফলাফল করার প্রবণতা এবং বর্তমানে এ প্লাস বা স্বর্ণখচিত এ প্লাস পাওয়ার প্রতিযোগিতায় ব্যস্ত শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও অভিভাবকরা শুদ্ধ বানান ও বাংলা ভাষা চর্চার দিকে মনোযোগ দেয়ার সময় পাচ্ছেন না। তাই দীর্ঘ প্রতিযোগিতায় বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া মেধাবী ফল করা ছাত্রছাত্রীরা যখন ভুল বানান আর দুর্বল বাক্য গঠনে উত্তরপত্র লেখে, তখন বোঝা যায় সংকটটি কোথায়। আমার মতো মাঝবয়সী অনেকেই স্মরণ করতে পারেন, শুদ্ধ বানান আর বাক্যে বাংলা ও ইংরেজি লেখাটা স্কুলই শিখিয়ে দিত। এখন এসবের ধার ধারে না কেউ। এক পৃষ্ঠা ইংরেজি লেখায় একটি শব্দের বানানে 'ই'-এর বদলে 'এ' হয়ে গেলে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যায়। এমন অকাট মূর্খ ছাত্রের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়েন শিক্ষক-অভিভাবক। অন্যদিকে বাংলা বানান পাঁচটা ভুল করলেও অর্ধেকটা মাত্র চোখে পড়ে শিক্ষকের। বাংলা বানানে ভুল আর বাক্য গঠনে সাধু-চলিত মিশে গেলেও তা গর্হিত অপরাধ নয় জেনেও শিক্ষার্থী বিষয়টিকে গুরুত্ব দেয় না। এ কারণে বর্তমানে শিক্ষকতায় আসা (স্কুল থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত) তরুণ শিক্ষকদের একটি বড় অংশের বাংলা ভাষা আর বানানের দুর্বলতা তাদের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যেও পল্লবিত হচ্ছে। অন্যদিকে বিশ্বায়নের খণ্ডিত ব্যাখ্যায় আর চারপাশের ইংরেজি মাধ্যম শিক্ষার দাপটে মূলধারার বাংলা মাধ্যমে পড়া শিক্ষার্থীরা এক ধরনের হতাশা ও বিভ্রান্তির মধ্যে পড়ে না ঘরকা না ঘাটকা দশায় পৌঁছেছে।

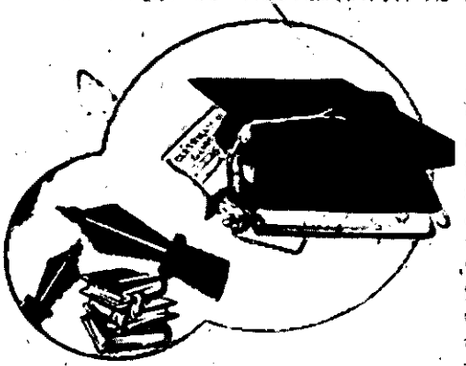

ইংরেজি মাধ্যমে স্কুলপড়ুয়া শিক্ষার্থীরা বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে দ্রুত। দেশের ইতিহাস ও সংস্কৃতি শেখার তেমন অবকাশ নেই তাদের পাঠক্রমে। বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য থেকে বিচ্ছিন্ন এ প্রজন্মের অনেকেই। অদ্ভুত বিষয় হচ্ছে, এ ধারার শিক্ষার্থীরা তাদের পাঠক্রম বিন্যাসের দুর্বলতার কারণে যতটা ভালো ইংরেজি বলতে পারছে, ততটা ভালো দখল দেখাতে পারছে না ইংরেজি ভাষা ও গ্রামারে। বিশেষ করে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন এদের মধ্যে দেশাত্মবোধ তৈরি হওয়াটা খুব কঠিন।

আলিয়া ধারার মাদ্রাসা শিক্ষা বাংলা মাধ্যম মূলধারার সঙ্গে অনেকটাই সম্পর্কিত। তাই বাংলা মাধ্যম শিক্ষার অনুরূপ সংকট এ অঙ্গনেও রয়েছে। তবে সবচেয়ে বড় সংকটে আছে কওমি মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা। এদেশের মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের এক-তৃতীয়াংশ কওমি মাদ্রাসায় পড়ে। আরবি, ফারসি ও উর্দু কওমি মাদ্রাসার শিক্ষা মাধ্যম। বাংলা ও ইংরেজির সঙ্গে এদের তেমন কোনো সম্পর্ক নেই। দেশ, জাতি ও জাতীয় ঐতিহ্য সম্পর্কে এ অঙ্গনের শিক্ষার্থীদের অনেকের ধারণাই খুব অস্পষ্ট। এরা নিজেদের এবং দেশ ও সমাজের বোঝায় পরিণত হচ্ছে। একটি জাতির সংস্কৃতি তার ভাষার বাহনে চড়ে ছড়িয়ে পড়ে। ভাষা হারিয়ে ফেললে প্রজন্ম সংস্কৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। ফলে যে কোনো অশুভ শক্তি জাতিকে আজ্ঞাবহ দাসে পরিণত করতে পারবে সহজেই। পাকিস্তানি শাসকচক্র এ সত্য ১৯৪৭ সালেই বুঝেছিল। তাই বাংলা ভাষার ওপরই প্রথম আঘাত হানে। আমাদের পূর্বসূরিরা আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষা করে আত্মপরিচয়কে সমুন্নত রাখতে পেরেছিল। কিন্তু চৈতন্য-বিচ্ছিন্ন আমরা নানাভাবে একে লালন করতে ব্যর্থ হচ্ছি। এক ধরনের উগ্র আধুনিকতা ও অপূর্ণ বৈশ্বিক ভাবনা এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে বাজার অর্থনীতির বিকৃত ধারণা থেকে আমরা বাঙালি সংস্কৃতির বিকলাঙ্গ অবয়ব উপস্থাপন করছি। আমাদের চারপাশে অর্থবিত্তে আভিজাত্য খোঁজা অনেক পরিবারকেই পাওয়া যাবে, যাদের বাংলা ভালো বলতে না পারা বা লিখতে না পারার মধ্যে এক ধরনের অহমিকার ছোঁয়া থাকে।

আমার শিক্ষক প্রয়াত খ্যাতিমান ইতিহাসবিদ, সাবেক অর্থমন্ত্রী ড. এ আর মল্লিক ক্লাসে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে একটি গল্প বলেছিলেন। প্রতি ফেব্রুয়ারিতে এ গল্পটি নতুন করে মনে পড়ে আমার। মুক্তিযুদ্ধের আগে থেকেই স্যার মোহাম্মদপুরের বাসিন্দা ছিলেন। সে সময়ে তাদের বাসায় এক বিহারি ভিক্ষুক আসতেন। ভিক্ষা চাইতেন তার প্রতিদিনের ভাষা উর্দুতে। মুক্তিযুদ্ধের পর একদিন স্যারের দরজায় সেই বৃদ্ধ ভিখারি এলেন। যথারীতি উর্দুতেই ভিক্ষা চাইছেন। স্যারের কাছে এটা বিসদৃশ লাগল। তিনি বললেন, বাংলায় ভিক্ষা না চাইলে তিনি ভিক্ষা দেবেন না। এবার অসহায় হয়ে পড়লেন ভিক্ষুক। উপসংহার টানলেন স্যার। বললেন, ও বেচারা হয়তো ঢাকায় কাটিয়ে দিয়েছে জীবনের সবচেয়ে বড় সময়। কিন্তু জীবনযাত্রার কোনো পর্যায়েই তার বাংলা শেখার দায় পড়েনি। ভাঙা-আধভাঙা উর্দুতে তাকে সাহায্য করেই আমরা গৌরববোধ করেছি। অর্থাৎ আমরা আমাদের আত্মমর্যাদাবোধকেই যেন খুঁজে পাইনি।

সামাজিক জীব হিসেবে বসবাস করতে হয় বলে নিজের নেয়া শপথ নিজেকেই ভাঙতে হয় বারবার। বাঙালি পরিবারের বিয়ে ধরনের সামাজিক অনুষ্ঠানে ইংরেজি ভাষায় দাওয়াতপত্র পেলে তেমন অনুষ্ঠানে যাব না বলে একসময় সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। শেষ পর্যন্ত সামাজিকতার দায়ে সিদ্ধান্তে অটল থাকতে পারি না। এ প্রবণতা ইদানীং অনেক বেড়ে গেছে। ব্যবসায়ী, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, আমলা, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব থেকে শুরু করে সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারও ইংরেজিতে দাওয়াতপত্র লিখে আত্মপ্রসাদ লাভ করে। আমাদের সমাজ বাস্তবতায় বিয়ে অনুষ্ঠানে শিক্ষিত-স্বল্পশিক্ষিত নানা স্তরের আত্মীয়কে দাওয়াত দিতে হয়। একসময় দেখতাম ডাকঘরে অশিক্ষিত মানুষের চিঠি লিখে দেয়ার জন্য পয়সার বিনিময়ে লেখক থাকত। এখন বোধহয় বিয়ের দাওয়াতপত্র পড়ে দেয়ার জন্য আরেকটি পেশা সৃষ্টি হতে পারে। কয়েক বছর আগের কথা। তখন সরদার ফজলুল করিম স্যার জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতেন ক্লাস নিতে। স্যারকে একদিন জিজ্ঞাসা করেছিলাম, এক বাঙালি আরেক বাঙালিকে তার সামাজিক অনুষ্ঠানে ইংরেজিতে দাওয়াত করেন কেন? মৃদু হেসে স্যার বলেছিলেন, এটি এক ধরনের শ্রেণী-চরিত্র। অর্থবিত্ত বা অবস্থানে সে যে একটু উঁচুতে তা প্রকাশের একটি সুযোগ খোঁজে এখানে। এ ধারার সবাই এ শ্রেণীভুক্ত হতে চায়।

প্রজন্মকে স্বজাত্যবোধ থেকে দূরে সরাতে আমাদের টিভি চ্যানেল আর বেসরকারি রেডিও কম কসরত করছে না। তরুণ প্রজন্মের উদ্দেশে তৈরি অনেক অনুষ্ঠানে উপস্থাপক 'প্রিয় দর্শক'-এর বদলে 'হাই ভিউয়ার্স' বলে হাত-পা ছুড়ে মাঝে মধ্যে অদ্ভুত উচ্চারণে ইংরেজি শব্দ বলে এক অদ্ভুত খিচুড়ি বানাতে থাকে। এসব অনুষ্ঠানের প্রভাবও কম নয়। ক্যাম্পাসে বা পথেঘাটে তরুণ-তরুণীর শব্দচয়ন ও অঙ্গভঙ্গি দেখলে এর সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায়।

বাংলা একাডেমি একটি প্রমিত বাংলা বানানরীতি প্রণয়ন করেছে। আবার জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড তাদের বই লেখার জন্য একটি বানানরীতি ধরিয়ে দেয়। বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে লিখতে গিয়ে আরেক বিড়ম্বনায় পড়তে হয়। আমার প্রমিত বানানরীতির কোনো কোনো বানান সংশোধন করা হয়। জানতে চাইলে বলা হয়, এটি এই পত্রিকার সম্পাদকীয় নীতিমালা।

এসব অসঙ্গতি দেখলে বোঝা যায়, একুশের চেতনা আমাদের চৈতন্যোদয় ঘটাতে পারেনি এখনও। একুশের চেতনা অন্য ভাষাকে বৈরী জ্ঞান করা নয়— নিজ ভাষা ও সংস্কৃতিকে সম্মান দেয়া। আত্মগৌরববোধ ছাড়া প্রজন্ম দেশপ্রেমিক হতে পারে না। নিজ দেশ নিয়ে বড় স্বপ্ন বুনতে পারে না।

কিন্তু আমার ভয় হয় আমাদের চেতনার বিকলাঙ্গ দশা দেখে। প্রতি ফেব্রুয়ারিতেই আমি নিবন্ধ লিখে হারিয়ে যাওয়া প্রভাতফেরিকে ফিরিয়ে আনার জন্য হা-হুতাশ করি। কিন্তু পাত্তা পাই না কোনো অঙ্গন থেকেই। আমার মনে হয়, প্রভাতফেরি ছিনতাই হওয়ার পর থেকেই ওলটপালট হয়ে গেছে একুশের চেতনা। প্রভাতফেরি শব্দটি শুধু একুশের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে। বাঙালি সংস্কৃতির এ যেন প্রতীকী শব্দ। বাঙালি সংস্কৃতিতে দিনের হিসাব প্রত্যুষ থেকে সন্ধ্যা। তাই একুশের প্রথম প্রহর প্রত্যুষে নগ্ন পায়ে একুশের গানের সুর-মূর্ছনায় শহীদ মিনারে যাওয়ার আলাদা রোমাঞ্চ ছিল। কিন্তু একপর্যায়ে সামরিক ও সামরিক মদদপুষ্ট শাসকরা নিজ নিরাপত্তার প্রশ্নে পাশ্চাত্যের হিসাবে মধ্যরাতে একুশের প্রহর গুনতে শুরু করে। মুখরিত করে শহীদ মিনার। আমাদের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলো তা ওহাম্ন বলে মেনে নেয়। এভাবে নতুন প্রজন্ম বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে প্রভাতফেরি থেকে। ফলে একুশের চেতনায় যে স্বাতন্ত্র্য আছে, তা তাদের পক্ষে অনুভব করা কঠিন হয়ে যায়।

আমি বিশ্বাস করি, আমাদের রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনের সব দেশপ্রেমিক মানুষ যদি ঐক্যবদ্ধভাবে একুশের চেতনাকে ফিরিয়ে এনে জাতীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতির নীতি প্রণয়ন করেন, তবে নতুন প্রজন্মের মধ্যে দেশাত্মবোধ জাগিয়ে তোলা সহজ হবে। দেশাত্মবোধহীন জাতি কি দেশের সার্বিক উন্নয়নের দায়িত্ব নিতে পারে?

ড. এ কে এম শাহনাওয়াজ : অধ্যাপক, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
shahnawaz7b@gmail.com